চোলদের শাসন ব্যবস্থা

চোলদের শাসন ব্যবস্থার জন্য আমাদের প্রধানত লেখর উপর নির্ভর করতে হয়, যদিও এই লেখগুলির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা সর্বদা একমত নন। বৈদেশিক বিবরণে চোলদের শাসন ব্যবস্থার উপর আলোকপাত বিশেষ পাওয়া যায় না। চোল আমলের মুদ্রা, সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে খুবই অকিঞ্চিৎকর।

দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাষ্ট্রকূট রাষ্ট্রবিন্যাসের সঙ্গে চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসের মৌলিক পার্থক্য ছিল। সামন্ত নরপতিগণ চালুক্য-রাষ্ট্রকূট রাজাদের উচ্চাশাকে খর্ব করতেন। একমাত্র চোলগণই দীর্ঘকাল ধরে সামন্ত নরপতিদের প্রভাব অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাপকভাবে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

সঙ্গম যুগের মত চোল আমলেও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ভারতের আদিম রাজতন্ত্র এবং চোলদের রাজতন্ত্র, প্রকৃতিতে এক ছিল না। অসংখ্য প্রাসাদ এবং কর্মচারি, ও বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ এই রাজতন্ত্র বাইজানটাইন রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। চোলদের সময় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এই পরিণতির সঙ্গে সংগতি রেখে চোল রাজাদের অভিধাও পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা 'চক্রবর্তিগল' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। রাজরাজের সময় প্রতিটি প্রস্তর লেখতে রাজত্বের প্রধান ঘটনাবলী ভূমিকা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হত। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শাসকের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা পরিস্ফুট হয়েছিল। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর মন্দিরকেও এই সচেতনতার প্রতীক বলা যায়। স্থাপত্য

Scanned with CamScanner

ছিল। এই অভিধাগুলি সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে তাদের এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, পার্থক্য সূচিত করত। সামরিক এবং বেসামরিক বিভাগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয় বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের 'অদিগারিগল' বলা হত। উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের সাধারণত 'পেরুন্দরম' এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারিদের 'সিরুদনম' বলা হত। উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী কর্মচারিদের বলা হত 'সিরুদনত্তুপ-পেরুন্দরম'। সেনাপতিগণও এই শ্রেণীভুক্ত বিবেচিত হতেন। বিভিন্ন পদ বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ প্রথা কী ছিল, জানা যায় না। জন্ম ও বংশ কৌলীন্যকে অবশ্যই মর্যাদা দেওয়া হত। কর্মজীবনে উন্নতির জন্য যোগ্যতাকে বড় করে দেখা হত। যে রাষ্ট্রবিন্যাসে সিংহাসনে উত্তরাধিকারের ক্রমে যোগ্যতার স্থান ছিল এত বড়, সেখানে কর্মচারিদের উন্নতি যে যোগ্যতার উপর নির্ভর করত, এমন অনুমান করা যায়। কর্মচারিগণ তাদের প্রাপ্য নগদ অর্থে পেতেন না। তাঁদের ভূমি দান করা হত। এই জমি থেকে তাদের যা আয় হত, তার একাংশ তাঁরা ভোগের মাধ্যমে, অন্যাংশ অর্থের মাধ্যমে নিতেন। ভূমিদান বলতে মালিকানা স্বত্ব দান করা বোঝাত না। জমিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি অধিকারের হস্তান্তর বোঝাত। জমির মালিকানা ছিল ব্যক্তি বিশেষের, অথবা গ্রাম সম্প্রদায়ের হাতে। এই ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা এবং দুর্নীতির সুযোগ ছিল। সাকোল ভূমির অধিকার সম্পর্কিত লেখ্যগুলি নিখুঁতভাবে রক্ষা করতেন। তাছাড়া গ্রামের জনমতও এই ব্যবস্থার পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য করত। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার প্রধানরূপে রাজা রাজ্য পরিক্রমা করতেন এবং প্রয়োজন হলে, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতেন। কেন্দ্রীয় কর ভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও কয়েকটি কর আদায়ের সুবিধা ভোগ করত। দ্বিতীয় রাজেন্দ্রর আদেশ থেকে জানা যায় যে, এই অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানের অধীন ছিল।

শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে ছিল স্বশাসিত গ্রাম। কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে বলা হত কুরুরম অথবা নাড়ু অথবা কোট্টম। বড় গ্রাম, যা একাই হয়ত একটি কুরুরম বিবেচিত হত, তাকে বলা হত তনিয়ুর। মধ্য যুগের ইংলণ্ডের 'বরো'র সঙ্গে এগুলি তুলনীয়। কয়েকটি কুরুরম নিয়ে একটি বলনাড়ু গঠিত হত। বলনাড়ুর উপরে ছিল 'মণ্ডলম' অথবা প্রদেশ। এগুলিই ছিল রাষ্ট্রবিন্যাসের বৃহত্তম বিভাগ। রাজরাজ চোলের রাজত্বকালের শেষে, সিংহলসহ এই মণ্ডলমের সংখ্যা ছিল আট কি নয়। চোল রাজত্বে এই সংখ্যা আর বাড়ে নি।

চোল আমলে ভূমিকরই ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস। এই কর

নগদ অর্থে অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করা হত। আমদানি রপ্তানী শুল্ক, নগরের প্রবেশদ্বারে দেয় শুল্ক এবং খনি অরণ্য প্রভৃতি থেকে রাজস্ব আসত। বিষ্টিরও প্রচলন ছিল। সব মিলিয়ে করের বোঝা খুবই ভারি ছিল। তা থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য অনেকে স্থান ত্যাগ করত। কোন অঞ্চল থেকে ব্যাপক ভাবে স্থান ত্যাগের আশঙ্কা কর সংগ্রহকারীকে সতর্ক রাখত।

সংগৃহীত রাজস্ব থেকে শাসনকার্যের ব্যয় বহন করা হত। অবশিষ্ট অংশে রাজা ইচ্ছামত ব্যয় করতেন। রাজ পরিবারের ভরণপোষণ এবং জাঁকজমকের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হত। কখনও যুদ্ধের জন্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্দিরের প্রয়োজনে বিশেষ কর ধার্য করা হত। অনেক সময় স্থানীয় সমিতি, কখনও বা রাজা করের দায় থেকে অব্যাহতি দিতেন। কখনও বা একসঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশি কর দিয়ে, ভবিষ্যতে কর দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত।

গ্রাম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য ভূমি করের জন্য গ্রাম সভাগুলি দায়ী থাকত। যুদ্ধ এবং মন্দিরের প্রয়োজনে ছাড়াও বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধের সংস্কার কার্যের জন্য অতিরিক্ত কর ধার্য করা হত। সর্বদা অতিরিক্ত কর ধার্য করার আগে করদাতাদের সম্মতি নেওয়া হত।

জমি এবং বাড়ি ছিল করের মুখ্য উপাদান। তাই নিপুণ ভাবে জমি জরিপের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম রাজরাজের রাজত্বের মধ্যভাগে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। পরবর্তী চোল রাজাদের একাধিক লেখতে এর উল্লেখ আছে। ভূমি রাজস্বের হার কী ছিল, সঠিক জানা যায় না, হয়ত এক তৃতীয়াংশ ছিল। তবে জমির উর্বরতা অনুসারে এই হারের তারতম্য ঘটত। কৃষি জমির উর্বরতা এবং উৎপন্ন ফসল পরিবর্তিত হলে, করের হারও নতুন ভাবে নির্ধারণ করা হত। প্রথম রাজরাজের তাঞ্জোর লেখতে স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রতি গ্রামে কিছু পরিমাণ জমি থাকত (যেমন বাসস্থান, মন্দির, পুকুর, খাল, শ্মশান ইত্যাদি) যার উপর কোন প্রকার কর ধার্য করা হত না। গ্রামের সমগ্র এলাকা থেকে এই অঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে, অবশিষ্ট পরিমাণ জমি করযোগ্য মনে করা হত। দেয় কর কঠোর ভাবে আদায় করা হত। পরবর্তীকালে করদাতাদের অন্যভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্থানীয় নরপতিগণ তখন কেন্দ্রীয় সরকারকে আগ্রাহ্য করে, নানা উপায়ে অর্থ আদায় করতেন। অস্বাভাবিক করের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত একেবারে ছিলনা, এমন নয়। বাকি কর আদায়ের জন্য জমি ক্রোক অথবা বিক্রয় করা হত। অনেক সময় মন্দিরকে পর্যন্ত কর দেওয়ার জন্য জমি বিক্রয় করতে হত।

চোল আমলের কর ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, নানা প্রকার সামাজিক ব্যয়ের মধ্য দিয়ে তা কমানো হত। চোল রাজাদের

Scanned with CamScanner

কাছে এবং বিভিন্ন মন্দিরে প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত থাকত। তবে তাঁদের ব্যয়ের পরিমাণও ছিল প্রচুর। ধনী ব্যক্তিরা মঠ-মন্দির, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় করে সামাজিক খ্যাতি অর্জন করতে চাইতেন। যে মন্দিরগুলি একদা বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল, চোল আমলে সেই মন্দির-গুলিই ছিল দুর্গত মানুষের একমাত্র আশ্রয় ও ভরসার স্থল।

বিচারের কাজ সাধারণত স্থানীয় ভাবে করা হত। গ্রামসভাগুলির বিচার সম্পর্কিত ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। রাজকীয় আদালতগুলিকে সম্ভবত 'ধর্মাসন' বলা হত। ধর্মাসনগুলিতে যে সব মামলা বিচারের জন্য আনা হত, সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য আইনজ্ঞ ব্রাহ্মণদের (ধর্মাসন-ভট্ট) সাহায্য নেওয়া হত। দেও-য়ানি এবং ফৌজদারি অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। সাধারণ ভাবে সব অপরাধেরই বিচার গ্রাম সভাগুলিতে হত। সেই বিচারে সন্তুষ্ট না হলে, মামলা নাড়ুর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির কাছে আনা যেত। উচ্চতর আদালতে সচরাচর আপীল করা হত না। দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তিতে অনেক সময়ে খুবই বিলম্ব হত। চুরি, ব্যভিচার, জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধকে গুরুতর মনে করা হত। এই সব অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রাম সভায় প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজদ্রোহের বিচার রাজা নিজে করতেন। শাস্তি হিসাবে অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত, অথবা তাকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হত। সাধারণ অপরাধের জন্য জরিমানা দিতে, অথবা কারাদণ্ড ভোগ করতে হত। দাঙ্গা (কলহম) এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটনোর জন্য জরিমানার পরিমাণ ছিল খুব বেশি, ২০,০০০ কাশু পর্যন্ত। শিবদ্রোহ, অর্থাৎ মন্দিরের সম্পত্তি নষ্ট করলে, অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মন্দিরের ক্ষতিপূরণ করা হত। রাজা বা তাঁর নিকট আত্মীয়ের উপর আক্রমণ হলে, রাজা স্বয়ং সেই অপরাধের বিচার করতেন। প্রথম রাজরাজের সময় এই অপরাধের জন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গরু চুরি ছিল একটি সাধারণ অপরাধ এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ ছিল না। চৈনিক লেখক চৌ-জু-কুয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চোলদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, লঘু অপরাধে অপরাধীকে একটা কাঠের সঙ্গে বেঁধে ৫০, ৭০ অথবা ১০০টি বেত্রাঘাত করা হত। জঘন্য অপরাধের জন্য অপরাধীর শিরশ্ছেদ করা হত, অথবা তাকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে মারা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নরহত্যার জন্য অপরাধীকে শাস্তি হিসাবে নিকটতম মন্দিরে স্থায়ীভাবে একটি প্রদীপ জ্বালানোর দায়িত্ব দেওয়া হত দেখে, অনেকে চোলদের শাস্তিদান ব্যবস্থাকে অতিশয় লঘু বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপরের বর্ণনা থেকে এই ধারণা খুব সঙ্গত মনে হয় না।

চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসের ভিত্তি ছিল গ্রাম। সেদিক থেকে চোলদের শাসন

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থার সঙ্গে গুপ্তদের শাসন ব্যবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু চোলদের গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি ভিন্ন ছিল। চোলগণ গ্রাম পর্যায়ে যে স্বাধীনতা ভোগ করত, তদানীন্তন কালে তাকে অভূতপূর্ব বলা যায়। চোলদের সরকারি কর্মচারিগণ গ্রামীণ ব্যাপারে দর্শক এবং উপদেষ্টা হিসাবে অংশগ্রহণ করতেন, শাসক হিসাবে করতেন না। এর ফলে উপরের স্তরে রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, তামিল অঞ্চলের সমাজ জীবনে ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। চোল আমলে যে গ্রাম শাসন ব্যবস্থা আমরা দেখি, আগেই তার সূচনা হয়েছিল। অষ্টম এবং নবম শতাব্দীর পাণ্ড্য ও পল্লবগণের লেখতে অনুরূপ শাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সে শাসন ব্যবস্থা চোলদের মত এত পরিণত ছিল না।

গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের দ্বারা গঠিত প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে গ্রাম শাসনই ছিল গ্রামীণ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। এই সমিতিগুলি ভিন্ন অনেকগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল। প্রতি গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট কাজ ছিল, অথবা তাকে একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষের দেখাশোনা করতে হত। সমাজ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে আইনত এই সমিতি এবং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিশেষ ভেদ ছিল না। কিন্তু কার্যত জাতীয় জীবনে তাদের গুরুত্ব ভিন্ন ছিল। গোষ্ঠীগুলি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়ে থাকত। সেই তুলনায় গ্রাম সমিতির কর্তব্য এবং দায়িত্ব ছিল অনেক ব্যাপক। গোষ্ঠী যে নির্দিষ্ট বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিল, সেই বিষয়ও সমিতির দায়িত্ব থাকত এবং কোন কারণে গোষ্ঠী ব্যর্থ হলে সমিতির কাছে আবেদন করা যেত। গোষ্ঠীর সদস্যগণ সমিতিরও সদস্য হতেন। তার ফলে গোষ্ঠী ও সমিতির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল না। গ্রামগুলি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত হত। প্রতিটি পাড়ার মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী গঠন করত। সূত্রধর, স্বর্ণকার, কর্মকার, ধোপা ইত্যাদি বৃত্তিজীবী মানুষের দ্বারা গঠিত গোষ্ঠীর দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না।

গ্রাম সমিতি ছিল দুইটি, ঊর এবং সভা। তাছাড়া শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের জন্য স্থানীয় সমিতি ছিল। তাকে বলা হত নগরম। এই সবগুলিই ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক সমিতি। এরা মোটামুটি ভাবে সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করত। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিগণ মাঝে মাঝে তাদের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করতেন। অন্যথায় তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করত। এই সমিতিগুলি যখন তাদের সংবিধান পরিবর্তন অথবা ভূমিস্বত্ব পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিগণ তাদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন। তবে তাঁরা কতটা প্রভাব বিস্তার করতেন, তা বলা যায় না।

স্থানীয় সমিতিগুলির মধ্যে ঊর ছিল সবচেয়ে সহজ ও সরল। অনেক

Scanned with CamScanner

স্থানে ঊর সভার পাশাপাশি থেকে কাজ করত। প্রয়োজন অনুসারে ঊর এককভাবে, অথবা সভার সঙ্গে যৌথভাবে কার্য নির্বাহ করত। অনেক স্থানে ঊরই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান। গ্রামের করদাতাদের নিয়ে ঊর গঠিত হত।

চোলদের লেখতে সভা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সর্বত্র এই সভা ব্রাহ্মণ-গ্রাম, অর্থাৎ চতুর্বেদিমঙ্গলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। রাজারা তাঁদের দানের দ্বারা অনেক মঙ্গলম সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান তখন পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। এইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং এই উপনিবেশগুলিতে ব্রাহ্মণগণ সভার মাধ্যমে স্থানীয় কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। কোথাও ব্রাহ্মণদের নতুন বসতি স্থানীয় প্রাচীন বাসিন্দাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলে, সেখানে ঊর এবং সভা দুই-ই পাশাপাশি থাকত। কখনও বা একই গ্রামে দুইটি ঊর থাকত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ১২২৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় সত্তমঙ্গলম গ্রামে দুইটি ঊর ছিল, একটি গ্রামের হিন্দু অংশের বাসিন্দাদের এবং অন্যটি জৈন অংশের বাসিন্দাদের।

ঊর কী ভাবে গঠিত হত, সঠিক জানা যায়। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক করদাতাদের দ্বারা গঠিত হলেও ঊরের আলোচনায় বয়স্করাই প্রাধান্য ভোগ করতেন। প্রতি ঊরে একটি শাসন পরিচালনা বিভাগ ছিল। এই বিভাগে সদস্য সংখ্যা কত ছিল এবং তাঁরা কী ভাবে নিযুক্ত হতেন, জানা নেই।

সভা অথবা মহাসভার স্থানীয় শাসন যন্ত্র তুলনায় অনেক বেশি জটিল। সাধারণ ভাবে এই মহাসভা বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সমিতির মাধ্যমে কাজ চালাত। এই কার্যনির্বাহী সমিতিগুলির পূর্ব ইতিহাস জানা নেই। তবে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল। চোল আমলের প্রথম দিকের কোন কোন লেখতে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য অস্থায়ী সমিতি গঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন মহাসভায় সমিতির সংখ্যা এবং তাদের সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন। মহাসভা সম্পর্কিত বেশির ভাগ লেখ তোণ্ডমণ্ডলম এবং চোলমণ্ডলমে পাওয়া গেছে। এই লেখগুলির মধ্যে প্রথম পরান্তকের রাজত্বকালের যথাক্রমে ৯১৯ ও ৯২১ খৃষ্টাব্দের দুইটি লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই লেখ দুইটি চিঙ্গেলপুট জেলার উত্তরমেরুর গ্রামে পাওয়া গেছে। এই লেখ দুইটিতে বিভিন্ন কার্যনির্বাহ সমিতির গঠন সম্পর্কিত ব্যবস্থার বর্ণনা আছে। প্রথম লেখটিতে যে ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, তা সন্তোষজনক মনে না হওয়ায়, দ্বিতীয় লেখ দ্বারা তা সংশোধিত হয়েছিল। কার্যনির্বাহী সমিতির এই সংশোধিত রূপ চোল রাজ্যের পক্ষে প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উভয় ক্ষেত্রেই যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা গ্রহণের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন।

Scanned with CamScanner

৯২১ খৃষ্টাব্দের লেখ অনুসারে উত্তরমেরুর গ্রামের ত্রিশটি কুড়ুম্বু অথবা পাড়া থেকে কার্যনির্বাহী সমিতিগুলির জন্য প্রথমে যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনীত করা হত। এই যোগ্যতার মাপকাঠি বেশ উঁচু ছিল। লেখটিতে মনোনয়নের জন্য কে যোগ্য এবং কে অযোগ্য দুই-ই বলা হয়েছে। যোগ্য হতে গেলে প্রায় দেড় একর পরিমাণ কর-দেয় জমি, স্বস্থানে স্বনির্মিত বাসগৃহ, ৩৫ থেকে ৭০ এর মধ্যে বয়স এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন হত। একটি বেদ এবং চারটি ভাষ্যের মধ্যে একটি ভাষ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে, ন্যূনতম জমির পরিমাণ অর্ধেক হলেও ক্ষতি ছিল না। যাঁরা পূর্ববর্তী তিন বৎসরের মধ্যে কোন সমিতির সদস্য ছিলেন, যাঁরা সমিতির সদস্য হিসাবে প্রয়োজনীয় হিসাব পেশ করতে পারেন নি, তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয়বর্গ, যাঁরা অবৈধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত, তাঁরা এবং আত্মীয়গণ এবং যাঁরা অন্যের দ্রব্য চুরির অপরাধে অভিযুক্ত, তাঁরা মনোনয়ন পেতেন না। অনুরূপ আরও অযোগ্যতার বর্ণনা এই লেখতে আছে। এইভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে, প্রতি কুড়ুম্বুর জন্য একজন হিসাবে ত্রিশজন লটারির মাধ্যমে নিযুক্ত হতেন। এই ত্রিশজনের মধ্যে যারা জ্ঞানী এবং বয়স্ক এবং যাঁদের ইতিপূর্বে উদ্যান অথবা পুষ্করিণী সমিতিতে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল, এমন বারো জনকে দিয়ে সম্বাৎসরিক সমিতি গঠিত হত। অবশিষ্ট বারোজন উদ্যান-সমিতি এবং ছয়জন, পুষ্করিণী সমিতি গঠন করতেন। আরও দুইটি সমিতি, স্থায়ী সমিতি এবং স্বর্ণ-সমিতি, অনুরূপ-ভাবে গঠিত হত। চোল আমলের স্বর্ণ মুদ্রায় গুণগত দিক থেকে আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দেওয়ায়, স্বর্ণ সমিতি গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। সমিতির সদস্যগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হতেন এবং তাঁরা কোন বেতন বা পারিশ্রমিক পেতেন না। শুধুমাত্র লটারির মাধ্যমে নিযুক্ত করা হলে, অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগের সম্ভাবনা ছিল। তাই প্রাথমিক মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চোলদের অন্যান্য লেখতে মোটামুটিভাবে অনুরূপ পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য যোগ্যতা এবং অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ, সর্বদা এক ছিল, একথা বলা যায় না। ঢোল বাজিয়ে মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হত। সাধা-রণত মন্দির প্রাঙ্গনে অধিবেশন বসত। বিভিন্ন মহাসভার মধ্যে বিনিময় এবং সহযোগিতা অজানা ছিল না।

মহাসভার করণীয় কাজ থেকে চোল আমলে গ্রাম-স্বরাজের পরিমাপ করা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহাসভা বিভিন্ন সমিতি গঠন করতে পারত। গ্রাম সম্প্রদায়ের জমির উপর মহাসভার মালি-কানাস্বত্ব ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মহাসভার নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল। অরণ্য এবং পতিত জমি উদ্ধারের সঙ্গে মহাসভা যুক্ত ছিল। উৎপন্ন ফসলের পরিমাপ এবং রাজস্ব নির্ধারণের কাজে মহাসভা রাজকীয় কর্মচারি-

Scanned with CamScanner

দের সঙ্গে সহযোগিতা করত। নির্ধারিত রাজস্ব মহাসভা আদায় করত। রাজস্ব আদায় না হলে, নীলামে জমি বিক্রয়ের অধিকার মহাসভার ছিল। মহাসভা জমি এবং জলসেচ অধিকার-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করত। সাধারণ ভাবে জমি জরিপের দায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরে জমির শ্রেণী বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটাতে হলে মহসভার সম্মতি নিতে হত। গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য কর ধার্য করার অধিকার মহাসভার ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুষ্করিণী খননের কথা বলা যায়। এই কর থেকে সংগৃহীত অর্থ, রাষ্ট্রের জন্য সংগৃহীত কর থেকে আলাদা রাখা হত। নির্দিষ্ট কারণে মহাসভা যে কোন ব্যক্তিকে এই বিশেষ কর থেকে অব্যাহতি দিতে পারত। দান এবং কর সংক্রান্ত লেখ্যগুলি, মহাসভা রক্ষা করত। পথ-ঘাট এবং পুষ্করিণী সহ সব রকম জলসেচ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল মহাসভার উপর। সীমিত অর্থ সামর্থ্যের মধ্যে মহাসভা বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করত। মহাসভার একটি সমিতি, ন্যায়ত্তার, বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করত।

রাজা এবং গ্রামের মধ্যে, রাজকীয় কর্মচারী, অধিকারি ভিন্ন, সামন্তগণ ছিল। সামন্তদের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক নিয়ে মহাসভাকে মাথা ঘামাতে হত না। রাজস্ব আদায় করে, তাঁর রাষ্ট্রীয় অংশ রাজার কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল সামন্তদের প্রধান কাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্ব আদায় করত মহাসভা।

ঊর এবং সভা অথবা মহাসভার মত আর একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। তাকে 'নগরম' বলা হত। কার্যাবলীর দিক থেকে ঊর এবং সভার সঙ্গে নগরমের বিশেষ মিল ছিল। কোন কোন স্থলে ঊর এবং নগরম পাশাপাশি থেকে তাদের কাজ করত। সম্ভবত নগরম ছিল ব্যবসায়ীদের একটি প্রাথমিক সমিতি। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে নগরম অন্যতম স্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছিল। যেখানে বাণিজ্য স্বার্থ প্রধান্য অর্জন করেছিল, সেখানে নগরমই ছিল একমাত্র স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। অনেকে নগরমকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ অথবা গিল্ড বলে বর্ণনা করেছেন। এই গিল্ডগুলি, বিভিন্ন দ্রব্য যেখানে উৎপন্ন হত, সেখানে কিনত এবং পরে তা অন্যত্র বণ্টন করত। তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত, কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমর্থনের নিশ্চিত আশ্বাস ছিল না। তবে প্রয়োজন হলে, যেমন শ্রীবিজয়ের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানেও নতুন বাজার দখল করা, চোল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল না। অন্য একটি দেশ বাণিজ্যের পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল, চোল রাজারা তা দূর করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য রাজা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ এই বাণিজ্যে অর্থ লগ্নী করতেন। কোন কোন বণিক সঙ্ঘের সম্পদের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, তার পক্ষে

Scanned with CamScanner

সমগ্র গ্রাম কিনে নিয়ে মন্দিরকে দান করা অসম্ভব ছিল না। ননদেশি গিল্ড দক্ষিণ ভারতে এবং সুমাত্রায় ব্যাপক ভাবে বাণিজ্য করত। এই গিল্ডগুলিতেও ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রভাব ছিল। চোল রাজারা ব্রাহ্মণদের উদার ভাবে জমি দান করেছিলেন। তাই হয়ত গিল্ডের সদস্য হিসাবে এই ব্রাহ্মণগণ রাজার রাজনৈতিক প্রভুত্বের বিরোধিতা করেন নি।

ইতিপূর্বে আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে যে নাড়ুর কথা বলা হয়েছে, তারও নিজস্ব সভা ছিল এবং এই সভাগুলি ভূমি রাজস্ব প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। নাড়ুর সভাকে 'নাত্তার' বলা হত। রাজরাজ নেগপতমের বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য যে আনৈমঙ্গলম গ্রাম দান করেছিলেন, সেই সম্পর্কিত আদেশ, অন্যান্যদের মধ্যে, পত্তিনককুররম-এর নাত্তারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই নাত্তার কী ভাবে গঠিত হত, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে এখানে যে গ্রাম দানের কথা বলা হল, তাতে সাক্ষরকারীদের নামের তালিকা থেকে মনে হয় যে, নাড়ুর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে নাত্তার গঠিত হত এবং এখানে অন্যান্যদের মধ্যে হিসাবরক্ষকগণও উপস্থিত থাকতেন। এই নাত্তারগুলি বিচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারিদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। তামিল লেখগুলির 'নগরম' ও নাড়ুর সঙ্গে, সংস্কৃত সাহিত্যের 'পৌর' ও 'জনপদের,' অন্তত নামের দিক থেকে বিশেষ মিল দেখা যায়।

উপরে যে প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলা হল, তাদের কর্ম পদ্ধতির বিবরণ কোন লেখতে নেই। কোন অধিবেশনে ন্যূনতম সদস্যদের উপস্থিতি দাবি করা হত না। কোন বিষয়ে ভোট গ্রহণের রীতিও ছিল না। কোন একটি বিষয় নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হত। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁদের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে এই আলোচনায় অংশ নিতেন। বিষয়টির সঙ্গে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ যুক্ত থাকলে, সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনা হত। তার পরে সকলের সম্মতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। ক্ষুদ্র উপদলীয় স্বার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করলে, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল না। তিরুভামাত্তুরের মন্দিরের সেবকদের পারিশ্রামিক যে সভায় স্থিরীকৃত হয়েছিল, তাতে মন্দিরের সেবকগণও উপস্থিত ছিলেন। এ থেকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তত একটি ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দুইটি গ্রামের মিলিত সভার অধিবেশনে দুইটি গ্রামকে এক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রথম পরান্তকের রাজত্বকালে, ৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি না জানিয়েও, দুইটি গ্রাম এক হতে পেরেছিল। এই ঘটনা থেকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা স্বাধীনতা ভোগ করত, তা বোঝা যায়। ব্রহ্মদেয়

Scanned with CamScanner

অথবা দেবদানকে কার্যকর করার জন্যও সংগঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতার প্রয়োজন হত।

গ্রাম শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুইজন গ্রামীণ কর্মচারির উল্লেখ চোলদের লেখতে পাওয়া যায়। এঁরা হলেন 'মধ্যস্হ' এবং 'করণত্তার'। চোলদের লেখতে 'মধ্যস্থ' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল, মনে হয়। মধ্যস্থগণ যে বিরোধের মীমাংসা করতেন, তা মনে হয় না। গ্রাম্য রাজনীতিতে এই কর্মচারিগণ নিরপেক্ষ থাকতেন বলে হয়ত তাঁদের মধ্যস্থ বলা হত। তাঁরা মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন না। তাঁদের কর্তব্য এবং পারিশ্রমিক মহাসভা নির্ধারণ করত। করণত্তার ছিলেন হিসাব পরীক্ষক। মনে হয় তাঁদের জমির সীমার উপরও নজর রাখতে হত। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে সভা একজন হিসাবপরীক্ষককে বরখাস্ত করেছিল এবং তাঁর বংশধর অথবা আত্মীয়গণ এই পদে নিযুক্ত হতে পারবে না বলে ঘোষণা করেছিল। এই ঘটনা থেকে গ্রাম শাসনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সভা কতটা সচেষ্ট ছিল, তা বোঝা যায়। গ্রামসভাগুলি দাতাদের যোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে গ্রামের কল্যাণ সাধনে ব্যক্তিগত দানকে উৎসাহিত করত। ১১২৯ খৃষ্টাব্দের একটি লেখতে তিরুপ্পের গ্রামের সভা, গ্রামের দুর্গতির দিনে উদারতা প্রদর্শনের জন্য জনৈক ভট্টের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উত্তরমেরুর গ্রামের সভা, স্থানীয় বিষ্ণু মন্দিরের সংস্কার সাধনের জন্য একজন বারাঙ্গনাকে বংশানুক্রমিক সুযোগ সুবিধা দান করেছিল।

উপসংহারে বলা যায় যে, চোল শাসন ব্যবস্থায় একদিকে ছিল যোগ্য আমলাতন্ত্র এবং অন্যদিকে ছিল সক্রিয় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। এই দুইয়ের সাহায্যে চোল আমলের শাসন ব্যবস্থা যে উচ্চ মান লাভ করেছিল, তা হয়ত অন্য কোন হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

Scanned with CamScanner